সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ
(Social Institutions and Agencies and Prevention of Social Problem)

ইউনিট 4

ভূমিকা
মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাসরত মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। যেমন– বিবাহ, পরিবার, জ্ঞাতি সম্পর্ক, সম্পত্তি, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, এতিমখানা ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা একদিকে মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ করে অন্যদিকে নানাবিধ সমস্যা মোকবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজ গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং মানুষ তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, মানসিক আনন্দ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন এবং জ্ঞানচর্চা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৪.২ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা এবং কার্যাবলী
পাঠ-৪.৩ : সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা
পাঠ-৪.৪ : বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ
পাঠ-৪.৫ : ধর্মের ধারণা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা
পাঠ-৪.৬ : ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ
পাঠ-৪.৭ : গণমাধ্যমের ধারণা, ধরন ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা
পাঠ-৪.৮ : গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ
পাঠ-৪.৯ : আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা, ধরন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা
পাঠ-৪.১০ : আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তাদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাঠ-৪.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ধারণা এবং বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Social Institution and Social Agency)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–
৪.১.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.১.২ সামাজিক সংস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.১.৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
৪.১.৪ সামাজিক সংস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.১.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা (Concept of Social Institution)
সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সমস্যা সমাধান, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান মূলত সমাজদেহের কার্যনির্বাহী অঙ্গ। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত কোনো স্থায়ী কাঠামো বা সংগঠনকে বোঝায়। যেমন– পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি। আবার অন্য অর্থে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠান, রীতি বা কর্মপদ্ধতি। যেমন– বিবাহ, সরকার প্রভৃতি।

সমাজবিজ্ঞানী Sumner and Keller (১৯৮৩) তাঁদের "*An Introduction to the Science of Society*" গ্রন্থে বলেন, "প্রতিষ্ঠান হলো এমন এক সক্রিয় ব্যবস্থা যা সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে (An institution is a vital interest or activity which surrounded by a cluster of mores and folkyays.)।"

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণায় H. E. Barnes (১৯৪২) তাঁর "*Social Institution*" গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক কাঠামো ও যন্ত্রস্বরূপ যার মাধ্যমে মানবসমাজ সংগঠিত ও পরিচালিত হয় এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ সম্পাদন করে (Social institutions are social structure and machinery through which human society organizes, directs and excutes the multifarious activities required to satisfy human needs.)।" সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজের সংজ্ঞানুযায়ী, "প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেসব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি, যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত ও অনুমোদিত এমন এক নিয়ম বা পদ্ধতি যা মানুষের আচার-আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজজীবনে শৃঙ্খলা ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৪.১.২ সামাজিক সংস্থার ধারণা (Concept of Social Ageney)

সামাজিক সংস্থা সমাজস্থ এমন একটি স্থান যেখান থেকে কোনো বিশেষ বিষয়ে সেবাদান করা হয়। সেবাদানের কেন্দ্রবিন্দু হলো সামাজিক সংস্থা। সাধারণত এজেন্সি শব্দটি কোনো বিষয়ের কার্যালয় বা অফিস হিসেবে গণ্য হয়। কোনো কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অন্য কোনো স্থান, অফিস বা কার্যালয় নিযুক্ত করাকে এজেন্সি বা সেবাদান স্থান বলা হয়। সামাজিক সংস্থা কেবলমাত্র সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের নিযুক্ত কেন্দ্র বা কার্যালয়কে বোঝায়।

The Social Work Dictionary (১৯৯৫) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, "সামাজিক সংস্থা হলো এক ধরনের সংগঠন বা সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা যাতে একটি পরিচালনা বোর্ডের উদ্যোগে সমাজসেবার সুব্যবস্থা করা হয় এবং সাধারণত মানবসেবা কর্মীদের দ্বারা সেবা প্রদান করা (Social agency is an organization or facility that delivers social services under the auspices of a board of directors and usually by human services personnel.)।"

মানবসেবামূলক তৎপরতায় নিযুক্ত আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিকে সামাজিক সংস্থার আওতাভুক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা প্রভৃতি সামাজিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক সংস্থা হলো এমন একটি সাংগঠনিক সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা যা সচরাচর পরিচালকদের বোডের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এবং মানবসেবা প্রদানকারী কর্মীদের দ্বারা সমাজসেবা প্রদান করে থাকে।

৪.১.৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Institution)

সামাজিক প্রতিষ্ঠান নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নিচে এর কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

১. মানুষের বহুমুখী চাহিদা ও প্রয়োজন থেকে সৃষ্ট;
২. সমাজদেহের কার্যনির্বাহী অঙ্গ;
৩. সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সমাজস্বীকৃত হতে হবে;
৪. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম;
৫. সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল;
৬. সামাজিক স্থায়িত্বের রক্ষাকবচ;
৭. যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতির সূতিকাগার;
৮. সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজ পরিচালনার বাহন;
৯. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্মভার হস্তান্তরিত হতে পারে;
১০. গতিশীল ও পরিবর্তনশীল; এবং
১১. সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সমাজজীবনের জন্য অপরিহার্য।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাহন। এর সদস্য হওয়া যায় না, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান এ দুই অর্থেই Social Institution প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা এর কর্মপদ্ধতি যদি খুব কঠোর হয়, তখন মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস এর ভাষায়, মানবজীবনের যা কিছু মহৎ ও কল্যাণকর তার সবই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক যুগ হতে অন্য যুগে বর্তায়।

৪.১.৪ সামাজিক সংস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Agency)

সামাজিক সংস্থার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. সামাজিক সংস্থা সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ের হতে পারে। তবে এর পরিচয় হলো সমাজসেবামূলক;
২. সামাজিক সংস্থা সমাজ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাধারণত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এর কর্মতৎপরতার অন্তর্ভুক্ত;
৩. সমাজে যে সমস্যা রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য সামাজিক এজেন্সি ভূমিকা পালন করে;
৪. সমষ্টিকেন্দ্রিক সেবাদানের জন্য এজেন্সি ব্যবহৃত হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমষ্টির সেবা প্রদানের বাহন হিসেবে এজেন্সিগুলো পরিচিত;
৫. সামাজিক সংস্থা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দিক। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উন্নয়ন এর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত;
৬. সামাজিক সংস্থার অর্থসংস্থান হয় মানবহিতৈষী দান, অনুদান, সরকার প্রদত্ত অর্থ, সেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফি ও অন্যান্য উৎস থেকে;
৭. সামাজিক এজেন্সির পরিধি সীমিত এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে সেবা প্রদান করে থাকে;
৮. সামাজিক সংস্থা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো স্থায়ী ও সর্বজনীন নয়। এটি বিলুপ্ত হতে পারে কিংবা দর্শনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন করে শুরু হতে পারে; এবং
৯. সামাজিক সংস্থার টার্গেট গ্রুপ ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী এবং সারাদেশ বা সমগ্রবিশ্ব হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সমস্যা সমাধান, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত কোনো স্থায়ী কাঠামো বা সংগঠনকে বোঝায় যেমন– পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি। আবার অন্য অর্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠান, রীতি বা কর্মপদ্ধতি। যেমন– বিবাহ, সরকার প্রভৃতি। অন্যদিকে সামাজিক সংস্থা সমাজস্থ এমন একটি স্থান যেখান থেকে কোনো বিশেষ বিষয়ে সেবা দান করা হয়। সাধারণত এজেন্সি শব্দটি কোনো বিষয়ের কার্যালয় বা অফিস হিসেবে গণ্য হয়। কোনো কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অন্য কোনো স্থান অফিস বা কার্যালয় নিযুক্ত করাকে এজেন্সি বা সেবাদান স্থান বলা হয়। সামাজিক সংস্থা বলতে কেবল সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের নিযুক্ত কেন্দ্র বা কার্যালয়কে বোঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজদেহের কার্যনির্বাহী অঙ্গ বলা হয় কোনটিকে?

ক) সামাজিক প্রতিষ্ঠান খ) সামাজিক অনুষ্ঠান
গ) সামাজিক সংস্থা ঘ) সামাজিক প্রথা

২। সামাজিক সংস্থা হলো এক ধরনের সংগঠন বা সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা যাতে–

i. একটি পরিচালনা বোর্ডের উদ্যোগে সমাজসেবার সুব্যবস্থা করা হয়
ii. টার্গেট গ্রুপ ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী, সারা দেশ বা সমগ্র বিশ্ব হতে পারে
iii. সাধারণত মানবসেবা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা এবং কার্যাবলী (Concept and Activities of Marriage and Family as Social Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.২.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.২.২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.২.৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
৪.২.৪ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.২.১ বিবাহের ধারণা (Concept of Marriage)

বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি সামাজিক চুক্তি, যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে। অর্থাৎ নর-নারীর দাম্পত্য বন্ধনকে বিবাহ বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, বিবাহ জিনিসটা সভ্য সমাজের অন্যসব ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সাথে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা। বিবাহ সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী Robert H. Lowie (১৯১৯) তাঁর গ্রন্থ "Primitive Society" উল্লেখ করেন, "বিবাহ হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য সঙ্গীর মধ্যে মোটামুটি স্থায়ী বন্ধন (Marriage relatively permanent bond between permissiable mates)।"

সমাজবিজ্ঞানী B. Malinowski বিবাহের ধারণায় "*Encyclopedia of Britannica*" (vol. 14) তে বলেন, "সামগ্রিকভাবে বিবাহ হচ্ছে যৌন সম্পর্কের আইনসম্মত অধিকার প্রদানের চেয়ে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তি (Marriage on the whole is rather a contract for the production and maintenance of children than an authorization of sexual intercourse.)।"

এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক (১৯২১) তাঁর "*History of Human Marriage*" গ্রন্থে বলেন, "বিবাহ হলো এক বা একাধিক পুরুষের সঙ্গে এক বা একাধিক স্ত্রীলোকের আইন কর্তৃক স্বীকৃত এক একটি সম্পর্ক যা বিবাহিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের সন্তানসমূহের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলো অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি করে।"

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, বিবাহ হচ্ছে সমাজ অনুমোদিত নর-নারীর এমন এক চুক্তি ও আইনগত সম্পর্ক যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় ও সন্তান উৎপাদিত হয়। এর মাধ্যমে নারী-পুরুষ বৈধভাবে একত্রে বসবাস ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করতে পারে।

৪.২.২ পরিবারের ধারণা (Concept of Family):

সাধারণত পরিবার হচ্ছে সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী সন্তানসহ একত্রে বসবাস করে। পরিবারের ধারণায় ম্যাকাইভার এবং পেজ (১৯৬৭) তাঁদেও "Society" গ্রন্থে বলেন বলেন, "পরিবার হলো এমন একটি গোষ্ঠী যাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্ক রয়েছে এবং সে সম্পর্ক সন্তান উৎপাদন ও লালন পালনের স্বার্থে যথেষ্ট সুস্পষ্ট এবং সৃষ্ট (The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and up brings of children.)।"

সমাজবিজ্ঞানী বি. ম্যালিনস্কি (B.Malinowski) এর মতে, "পরিবার হচ্ছে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তি।"

সমাজবিজ্ঞানী Meyer F. Nimkoff (১৯৬৫) তাঁর "Marriage and Family Living" গ্রন্থে পরিবারের ধারণায় বলেন, "পরিবার হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী কর্তৃক সৃষ্ট মোটামুটি স্থায়ী সংগঠন যেখানে সন্তান-সন্তুতি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।"

সামনার ও কেলার (Sumner and Keller) এর মতে, "পরিবার হচ্ছে রক্ত সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যা কমপক্ষে দু'পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

উপর্যুক্ত ধারণার আলোকে বলা যায়, পরিবার হচ্ছে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে সৃষ্ট পুরুষ ও নারীর একত্রে বসবাসের একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী বৈবাহিক ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে সন্তানসহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সদস্যসহ একত্রে বসবাস করে।

৪.২.৩ বিবাহের কার্যাবলী (Functions of Marriage)

মানবসমাজে বিবাহ একটি সর্বজনীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান। সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল, গঠনমূলক ও স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিবাহের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। বিবাহ প্রসঙ্গে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর "*Marriage and Morals*" গ্রন্থে বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, দুটি নরনারীর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক যদি কিছু থাকে তা হলো বিবাহ।" মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি দিকে বিবাহ যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

ক) পরিবার গঠন: বিবাহ হচ্ছে এমন একটি কার্যপ্রণালী যার মাধ্যমে পরিবার গড়ে ওঠে। মূলত বিবাহ হচ্ছে পরিবার গঠনের উপায়। কেননা একজন নারী এবং একজন পুরুষের মাঝে পারিবারিক জীবনের সূচনা ঘটিয়ে দেয় বিবাহ। বিবাহ ছাড়া পরিবার গঠন অসম্ভব। সুতরাং পরিবার গঠনে বিবাহের গুরুত্ব ও ভূমিকা অগ্রগণ্য।

খ) যৌন চাহিদা পূরণ: মানুষসহ সকল প্রাণীরই যৌন চাহিদা একটা সহজাত প্রবৃত্তি। নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের মধ্যে এ চাহিদা সৃষ্টি হয়, যা পূরণ করা অপরিহার্য। বৈধ ও সমাজস্বীকৃত পন্থায় এ চহিদা পূরণের একমাত্র পথ হচ্ছে বিবাহ। প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষের যৌন সংযোগ সম্পর্কের সামাজিক উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদান। বস্তুত এই উদ্দেশ্যকে সফল করে বিবাহ।

গ) সন্তান জন্মদান ও লালনপালন: সন্তান উৎপাদন ও লালনপালন বিবাহের অন্যতম কাজ। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। আর পরিবার হলো সন্তান উৎপাদন ও লালনপালনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। মানবশিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব বাবা-মার ওপর। বিবাহের মাধ্যমে বাবা-মা এ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন করায় শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালনে কোনো সমস্যা হয় না।

ঘ) উত্তরাধিকার: বিবাহ বংশের ধারা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহিত পিতামাতার সন্তান বংশ সুরক্ষায় সক্ষম হয়। সন্তান পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বিবাহই সন্তানকে অবৈধ সন্তান পরিচয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা করে পিতৃ পরিচয়ে গৌরবান্বিত করে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যালিওনসকির ভাষায়, বিবাহ কেবল যৌন মিলনের অনুমতি দেয় না, বরং পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব ন্যাস্ত করে।

ঙ) সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ: বিবাহের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হলো সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ। পতিতাবৃত্তি, নৈতিক অধঃপতন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নেশাগ্রস্ততা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিবাহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মরণব্যাধি এইডস-এর প্রধান কারণ হলো বহুগামিতা বা অবাধ যৌনাচার। নিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করে বিবাহ এইডস প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে।

চ) সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা: বিবাহ নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বিবাহ কেবল দু'জন নর-নারীর মধ্যেই মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে না, দুটো পরিবার তথা দুই পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে। বিভিন্ন মানুষ ও পরিবারের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করে। এতে করে সামাজিক পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

ছ) শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ: বিবাহের মাধমে দুজন নরনারী সুখের সংসার গড়ে তোলা সুযোগ পায়। পিতামাতার স্নেহের ছায়ায় ও তত্ত্বাবধানে সন্তানের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় এবং তারা সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও মানস গঠনে বিবাহ কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

জ) সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা: সমাজের স্থায়িত্ব ও সংহতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিবাহের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পরিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্ক প্রসারিত হয়ে পরিবারিক ও সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি করে। এ ধরনের ঐক্য সমাজে স্থায়িত্ব, সংহতি ও গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।

উপর্যুক্ত কার্যাবলী ছাড়াও বিবাহ ধর্মীয় নীতিমালা প্রতিষ্ঠা, প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা, মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি আনয়ন, আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক রীতিনীতি বজায় রাখা এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.২.৪ পরিবারের কার্যাবলী (Functions of Family)

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট পরিবারকে সমাজের জন্মকোষ (germinal cell) হিসেবে অভিহিত করেছেন। পরিবারের কার্যাবলীর সঠিক সীমারেখা টানা যায় না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের কার্যাবলীও পরিবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। Kingsley Davis এবং Bottomore পরিবার কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীকে চার ভাগে ভাগ করেছেন– ১) সন্তান প্রজনন (২) সন্তান প্রতিপালন (৩) কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা, এবং (৪) সামাজিকীকরণ। W.F. Ogburn and M.F. Nimkoff (১৯৪৭) তাঁদের "*A Handbook of Sociology* " গ্রন্থে পরিবার দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলীকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– (১) স্নেহ সম্পর্কিত, (২) অর্থনৈতিক, (৩) প্রমোদমূলক, (৪) নিরাপত্তামূলক, (৫) ধর্মীয় এবং (৬) শিক্ষা বিষয়ক। সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া মতামতের ওপর ভিত্তি করে পরিবারের সামগ্রিক কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হলো:

ক) জৈবিক চাহিদা পূরণ: মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি ও মৌল চাহিদা হচ্ছে জৈবিক চাহিদা। নারী-পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনের মধ্য দিয়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। সুতরাং জৈবিক চাহিদা পূরণ পরিবারের অন্যতম মৌলিক কাজ।

খ) মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ: পরিবার স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আদর-যত্ন, সহানুভূতি-সহমর্মিতা, প্রেম-প্রীতি প্রভৃতির মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্পন্ন করে।

গ) অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ: সামাজিক একক হিসেবে পরিবারকে নানাবিধ অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করতে হয়। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন, সংগ্রহ, বণ্টন, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ) সন্তান জন্মদান ও লালনপালন: পরিবার সন্তান জন্মদান ও রক্ষণাবেক্ষণের ধারক ও বাহক। মানবসমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা হলো পরিবার। সুতরাং সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে পরিবার মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ঙ) শিশুশিক্ষার কেন্দ্র: পরিবার হচ্ছে মানব জীবনের শাশ্বত বিদ্যাপিঠ। প্রতিটি শিশু পরিবার থেকে পারস্পরিক আচরণ, নীতিবোধ, আদর্শ ইত্যাদি গুণ শিখে থাকে। তাই পরিবারকে নাগরিকের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বলা হয়। পরিবারকে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা যায়, যার প্রধান পিতা বা মাতা। এ পরিমণ্ডল থেকে সন্তান-সন্ততি নেতৃত্ব, দায়িত্ব, কর্তব্য, নিয়মশৃঙ্খলা, অধিকার, আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে।

চ) ধর্মীয় শিক্ষার সূতিকাগার: পরিবার শিশুদের ধর্মীয়শিক্ষা প্রদানে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিকতা, সততা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি শিক্ষা দেয় পরিবার।

ছ) শিশুর সামাজিকীকরণ: মানবশিশুর সামাজিকীকরণ পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুকে সামাজিক জীবনের নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাা দিয়ে গঠনমূলক আচরণ বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অনন্য। এসব পদক্ষেপ শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

এছাড়া পরিবার তার সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, বিবাহদান, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কার্যসম্পাদন করে। পরিশেষে বলা যায়, পরিবার হলো মানব প্রকৃতির নার্সারি ও সামাজিক প্রথার সূতিকাগার। একটি সুন্দর জীবন, সুন্দর সমাজ, সুসংগঠিত জাতি ও রাষ্ট্রগঠনে পরিবারের ভূমিকা সর্বজনীন। অধ্যাপক রোজের মতে, Well integrated family life ensures astable national life।

সারসংক্ষেপ

বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি সামাজিক চুক্তি, যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে। অন্যদিকে, পরিবার হচ্ছে সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী সন্তানসহ একত্রে বসবাস করে। মানবসমাজে বিবাহ একটি সর্বজনীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান। সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল, গঠনমূলক ও স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিবাহের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। বিবাহ ধর্মীয় নীতিমালা প্রতিষ্ঠা, প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা, মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি আনয়ন, আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে, সামাজিক রীতিনীতি বজায় রাখে এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটায়। আবার পরিবার তার সদস্যদের নিরাপত্তাবিধান, সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, বিবাহদান, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কার্যসম্পাদন করে। পরিবার হলো মানব প্রকৃতির নার্সারি ও সামাজিক প্রথার সূতিকাগার। একটি সুন্দর জীবন, সুন্দর সমাজ, সুসংগঠিত জাতি ও রাষ্ট্রগঠনে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা সর্বজনীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দুইজন নরনারীর মধ্যকার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত সামাজিক চুক্তি কোনটি?

ক) বিবাহ   খ) পরিবার
গ) জ্ঞাতি সম্পর্ক   ঘ) উত্তরাধিকার

২। পরিবারের কার্যাবলী হলো–

i. নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করা
ii. শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া
iii. সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদাদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii   খ) i ও iii
গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা (The Role of Marriage and Family in Preventing Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৩.১ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৩.১ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা (Role of Marriage and Family in Preventing Social Problem)

সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হলো বিবাহ। বিবাহ ও পরিবার একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা বহুমুখী। সন্তান লালনপালন থেকে শুরু করে সদস্যদের প্রয়োজন পূরণ এমনকি পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠু নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকার পর্যায়ভুক্ত। যাতে সমাজবিরোধী কোনো ভূমিকায় পরিবারের সদস্যরা অবতীর্ণ না হয় সে বিষয়েও বিবাহ ও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহ ও পরিবারের এসব ভূমিকাকে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেখা যায়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন– যৌতুক, বাল্যবিবাহ, অপরাধ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন, জঙ্গিবাদ, অপুষ্টি, শিশু ও নারী নির্যাতন, মানসিক সমস্যা প্রভৃতি প্রথমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে তা পরিবার থেকে সমাজে সম্প্রসারিত হয়। ফলে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

১। **যৌতুক (Dowry):** যৌতুকের কবলে আজ গোটা সমাজ নিমজ্জিত। অর্থনৈতিক দৈন্যতা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের প্রশ্রয়ে সমাজে যৌতুকের ঘটনা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। যৌতুক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ যৌতুকের লেনদেন হয় বিবাহকে কেন্দ্র করে। আর পরিবার সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষাদান, সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা, ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রতকরণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি সুস্থ সামাজিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অভ্যাস গড়ে তোলে। বিবাহ ও পরিবারের এসব ভূমিকার কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং যৌতুক নামক অবাঞ্ছিত কুপ্রথার মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

২। **বাল্যবিবাহ (Early marriage):** বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক সমস্যা। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যহীনতা, দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব প্রভৃতি স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেসকল কারণে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি, সেসব দূর করার ক্ষেত্রে বিবাহ ও পরিবার ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন– সামাজিকীকরণ, নিরাপত্তাদান, নৈতিক শিক্ষাদান, মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, অধিকার সংরক্ষণ ও চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া মেয়েদের শিক্ষাদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সামাজিক আইন এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে। যেহেতু বাল্যবিবাহ পারিবারিক পরিমণ্ডলেই হয়ে থাকে তাই তা প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকাই অগ্রগণ্য।

৩। **অপরাধ (Crime):** বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো অপরাধ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ এবং মনোদৈহিক সমস্যাই অপরাধপ্রবণতার জন্য দায়ী। বিবাহ ও পরিবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবার মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ, সুস্থ বিকাশ, ব্যক্তিত্ব গঠন, নৈতিকতা, আদর্শ ও উপর্যুক্ত শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে শিক্ষা দেয়। তাছাড়া দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, শৃঙ্খলাবোধ, আইনের প্রতি আনুগত্যের গুণাবলি অর্জন, সমাজস্বীকৃত উপায়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪। **যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন (Sexual harassment and torture):** যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন একটি সামাজিক ব্যাধি। জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারিক বন্ধনে শৈথিল্য, সন্তানের প্রতি মা-বাবার উদাসীনতা, সুস্থ বিনোদন ও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, অশালীন পোশাক প্রভৃতি এর প্রধান কারণ। এ সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি ও মৌল চাহিদা হচ্ছে জৈবিক চাহিদা। বিবাহের মাধ্যমে সমাজস্বীকৃত উপায়ে এ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন অনেকটা প্রতিরোধ সম্ভব। পারিবারিক সুস্থ পরিবেশ, নৈতিকতা ও শালীনতার মূল্যবোধ সৃষ্টি, ছেলে সন্তানকে মেয়েদের সম্মান করার শিক্ষা, মেয়েদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নির্মল আনন্দদায়ক খেলাধূলা ও সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবার যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫। **জঙ্গিবাদ (Terrorism):** বর্তমানে জঙ্গিবাদ একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র ধর্মান্ধতা ও মুক্ত চিন্তা-চেতনার অভাব জঙ্গিবাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বিবাহ ও পরিবার মানুষকে সুস্থ বিকাশ, ব্যক্তিত্ব গঠন, উদার আদর্শ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা প্রদান করে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে, যা জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। পরিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, দেশপ্রেম, আইনের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি গুণাবলি শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবার বিজ্ঞানমনস্কতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং ধর্মীয় সর্বজনীন কল্যাণকর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার বিধানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে।

৬। **অপুষ্টি (Malnutrition):** পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব অপুষ্টি সমস্যার ব্যাপকতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। পরিবার তার সদস্যদের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমে অপুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, শিক্ষার মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য সংক্রান্ত নানা ধরনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর, বাসস্থান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে পরিবার অপুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৭। **শিশু ও নারী নির্যাতন (Violence against Child and Women):** শিশু ও নারী নির্যাতন বলতে শিশু ও নারীর উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোনো নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়, যা তাদের অধিকার খর্ব বা হরণ করে। শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শিক্ষাই হচ্ছে শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উত্তম উপায়। পরিবার মানবসন্তানের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ, পারিবারিক সুসম্পর্ক তৈরি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, নৈতিক শিক্ষা, অধিকার সংরক্ষণ, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবার শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮। **মানসিক সমস্যা (Mental Problem):** বিবাহ ও পরিবারের মাধ্যমেই শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, সুস্থ ও অসুস্থ নির্বিশেষে সবাই মানসিক বিকাশ ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। পরিবার মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির মনে হতাশা, ব্যর্থতা, হীনমন্যতা, আশঙ্কা প্রভৃতি দূর করে সুখানুভূতি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধের সৃষ্টি করে। পরিবারের মধ্যেই স্নেহ-ভালোবাসার প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ বর্তমান থাকে, যে কোনো শিশুর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারে। পরিবারের এ প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে মানুষের বহুবিচিত্র কামনা-বাসনা ও মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। মাতাপিতার স্বাস্থ্যকর দাম্পত্যজীবন, শিশুর প্রতি মাতাপিতার সঙ্গত ব্যবহার, সদস্যদের সহজাত স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা এবং পরিবেশের সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবার সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক একক হিসেবে মানুষের সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষা দান, সামাজিক আচার-আচরণ শেখানো, ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রতকরণ এবং সর্বোপরি সুস্থ সামাজিক ও ভারসাম্য জীবনের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবার সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হলো বিবাহ। আর বিবাহ ও পরিবার অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা বহুমুখী। সন্তান লালনপালন থেকে শুরু করে সদস্যদের প্রয়োজন পূরণ এমনকি পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠু নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকার পর্যায়ভুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন– যৌতুক, বাল্যবিবাহ, অপরাধ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন, জঙ্গিবাদ, অপুষ্টি, শিশু ও নারী নির্যাতন, মানসিক সমস্যা প্রভৃতি প্রথমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে তা পরিবার থেকে সমাজে সম্প্রসারিত হয়। ফলে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক একক হিসেবে মানুষের সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষা দান, সামাজিক আচার-আচরণ শেখানো, ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রতকরণ এবং সর্বোপরি সুস্থ সামাজিক ও ভারসাম্য জীবনের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবার সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান কোনটি?

ক) বিবাহ খ) পরিবার

গ) জ্ঞাতি সম্পর্ক ঘ) উত্তরাধিকার

২। জঙ্গিবাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো–

i. সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র ধর্মান্ধতা

ii. মুক্ত চিন্তা-চেতনার অভাব

iii. দেশপ্রেম ও আইনের প্রতি আনুগত্যহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Developing the Role of Marriage and Family)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৪.১ বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৪.১ বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Developing the Role of Marriage and Family):

বিবাহ ও পরিবার দুটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকেই মানবজাতির উন্নয়ন ও বিকাশ হয়েছে। বিবাহ ও পরিবারের সুষ্ঠু ভূমিকা পালনের ওপর নির্ভর করে সমাজের উন্নতি আর প্রগতি। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য সমাজকর্ম পেশা কর্তৃক নির্ধারিত ও স্বীকৃত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কলা কৌশলের ভিত্তিতে সমাজকর্মী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা পালনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বাস্তবমুখী তথ্যের প্রয়োজন। সমাজকর্মী এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বাস্তবমুখী ও কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা করে। সাধারণভাবে সমাজকর্ম পদ্ধতির আলোকে যদি সমাজকর্মীর ভূমিকাকে বিবেচনা করা হয় তাহলে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর তিন ধরনের ভূমিকা উল্লেখ করা যায়– ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা, খ) দলগত পর্যায়ের ভূমিকা এবং গ) সমষ্টিগত পর্যায়ের ভূমিকা। নিম্নে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ আলোচনা করা হলো:

ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা: ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী বিবাহিত দম্পতি ও পরিবারের যেসব সদস্য তাদের সঠিক ভূমিকা পালনে অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য পৃথক পৃথক কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে শিক্ষার মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন, দক্ষতা কাজে লাগানোর ক্ষমতার উন্নয়ন এবং ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ঘটানো হয়। অনেক সময় ব্যক্তির বন্ধু, আত্মীয় এবং সহকর্মী যারা তার ভূমিকা উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে তাদের নিয়েও কাজ করতে হয়।

খ) দলগত পর্যায়ের ভূমিকা: দলগত পর্যায়ে সমাজকর্মী বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সাহায্য করতে পারেন। দলগত পর্যায়ে সমাজকর্মী বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সকল সদস্যকে একসাথে নিয়ে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন, যা সাধারণত family group work এর অংশ। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমগ্র পরিবারটিকে একটি দল হিসেবে বিবেচনা করে পরিবারের সদস্যদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সাহায্য করার জন্য দল সমাজকর্মের কৌশলগুলো প্রয়োগ করতে পারেন। আবার role play method প্রয়োগ করার মাধ্যমেও সদস্যদের স্ব স্ব ভূমিকা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারেন, যা বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

গ) সমষ্টিগত পর্যায়ের ভূমিকা: সমষ্টিগত পর্যায়ে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী বিভিন্ন সভা, সেমিনার, টেলিভিশন, রেডিও এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবারের সঠিক ভূমিকা পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

এছাড়াও সমাজকর্মীগণ বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে তিন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকেন। যেমন– ১) প্রাক-বিবাহ পরামর্শ, ২) বিবাহ পরামর্শ এবং ৩) পারিবারিক পরামর্শ।

১) **প্রাক-বিবাহ পরামর্শ (Pre-marital councelling):** দাম্পত্য জীবনের সুখের মুলে রয়েছে উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন। বিবাহ প্রস্তুতিকালীন সময়ে সঙ্গী/সঙ্গিনী নির্বাচন ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মী তার পেশাগত দক্ষতা প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে তার সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করে থাকেন।

২) **বিবাহ পরামর্শ (Marriage councelling)**: প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দ এবং দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা থাকে। এ কারণে অনেক সময় দাম্পত্যজীবনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নয়ন ও জোরদারকরণে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিবাহ পরামর্শ কার্যক্রমে সমাজকর্মী কখনো স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা আলাদাভাবে, আবার কখনো এক সঙ্গে, আবার কখনো পরিবারের সদস্য ও সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করে একত্রে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৩) **পারিবারিক পরামর্শ (Family councelling)**: পারিবারিক সংহতি ও সম্পর্কন্নোয়ন, পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পরামর্শসেবা দেয়া হয়ে থাকে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মেলামেশা, যোগাযোগ, পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে পারস্পরিক উপলব্ধি ও আলোচনার সুযোগ বৃদ্ধি করা পারিবারিক পরামর্শ সেবার অন্তর্গত।

এ ছাড়াও পারিবারিক শিক্ষা, সামাজিকীকরণ, পারিবারিক বাজেট, পরিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বিকাশ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমাজকর্মী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যা পরিপূর্ণ পারিবারিক ভূমিকা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ

বিবাহ ও পরিবার দুটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকেই মানবজাতির উন্নয়ন ও বিকাশ হয়েছে। তাই বিবাহ ও পরিবারের সুষ্ঠু ভূমিকা পালনের ওপর নির্ভর করে সমাজের উন্নতি আর প্রগতি। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য সমাজকর্ম পেশা কর্তৃক নির্ধারিত ও স্বীকৃত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কলা কৌশলের ভিত্তিতে সমাজকর্মী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা পালনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বাস্তবমুখী তথ্যের প্রয়োজন। সমাজকর্মী এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বাস্তবমুখী ও কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা করে। এ ছাড়াও পারিবারিক শিক্ষা, সামাজিকীকরণ, পারিবারিক বাজেট, পরিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বিকাশ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমাজকর্মী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যা পরিপূর্ণ পারিবারিক ভূমিকা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকর্মের পদ্ধতির আলোকে সমাজকর্মী বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে কয় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকেন?

ক) তিন ধরনের খ) চার ধরনের
গ) পাঁচ ধরনের ঘ) ছয় ধরনের

২। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য সমাজকর্মী পেশাগত যেসব বিষয় প্রয়োগ করে থাকেন-

i. জ্ঞান ও দক্ষতা
ii. নীতি ও মূল্যবোধ
iii. কৌশল ও পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ ধর্মের ধারণা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা (Concept of Religion and the Role of Religion in Preventing Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৫.১ ধর্মের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৫.২ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.৫.১ ধর্মের ধারণা (Concept of Religion)

ধর্ম একটি মৌল ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সমাজ সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধর্মের ইংরেজি Religion শব্দটি ল্যাটিন Religere শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ সংযোগ বা বন্ধন। সুতরাং অভিধানিক অর্থে ধর্ম বলতে এমন এক বিষয়কে বুঝায়, যা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করে ও সংহতি আনয়ন করে। আবার সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু হতে ধর্ম প্রত্যয়ের উৎপত্তি। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা। এই অর্থে বলা যায়, মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম।

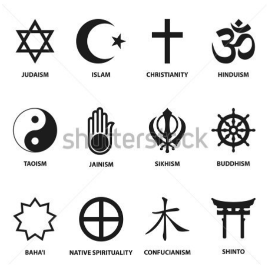

চিত্র ৪.৫.১ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্ম

সাধারণত ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসগত ব্যাপার, যাতে স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ই. বি. টেইলর (E.B. Tylor) ধর্মের ধারণায় বলেন, "ধর্ম হলো অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস এবং এরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সেগুলোর অনুশীলন (Religion is the belief in supernatural being and the institutions and Practices associated with these beliefs.)।"

ধর্মের সংজ্ঞায় জেমস জি. ফ্রেজার (James G. Frazer) বলেন, "ধর্ম হলো মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন এক শক্তিতে বিশ্বাস, যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

সমাজবিজ্ঞানী ইমিল ডুরখেইম (Emile Durkhaim) এর মতে, "ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত বিশ্বাস ও অনুশীলনের সুষম পদ্ধতি।"

ধর্ম সম্পর্কে গ্লক এবং স্টার্ক ((Glock and Stark) বলেন, "ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত উপাসনার রীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং অনুশীলনের প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি যা পারলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় (Religion is a institutionalized system of symbols, beliefs, values and practices focuses on questions of ultimate meanings.)।"

সুতরাং বলা যায়, ধর্ম হলো এমন কতগুলো নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান বা বিশ্বাস, যা মানবজীবনকে সত্য সুন্দর, পবিত্র ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, ধর্ম হচ্ছে এমন একটি মানসিক চেতনা যা সর্বশক্তিমান সত্ত্বার উপর মানুষের বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নানা রকম ধর্মীয় রীতিনীতি ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে।

৪.৫.২ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা (Role of Religion in Combating Social Problem):

সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে ধর্ম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। কেননা ধর্ম সমাজে নীতিবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে। প্রচলিত অর্থে আইনের যে বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক শাসন রয়েছে তার তুলনায় ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধসমূহ মানুষকে অপরধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে অধিক সাহায্য করে। ধর্মের যে নৈতিক ধ্যানধারণা তা মানুষের সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে এবং এ উপলদ্ধি থেকে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। নিচে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

ক) মানসিক নির্ভরশীলতা: ধর্ম দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য রোগগ্রস্ততা ইত্যাদি থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করে। মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন জটিল জীবনে নিপতিত হয়। এ সমস্ত জটিলতা থেকে মানুষ মুক্তি পাবার জন্য ধর্মের আশ্রয় নেয়। ধর্ম মানুষের মানসিক শক্তি ও আনন্দ দান করে। তাই মানুষ বিপদে শক্তি ও সাহস পায়। এ উপলদ্ধি মানুষের সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে সাহায্য করে।

খ) সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ: ধর্ম মানুষের সামাজিক মূল্যবোধগুলো বিকশিত করে সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। যেমন– মিথ্যাকথা বলা, দায়িত্বে অবহেলোা করা, চুরি করা, মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কাজ। ধর্ম এসব কাজকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দেয়। এর ফলে মানুষ সচরাচর এসব কাজে উদ্বুদ্ধ হয় না।

গ) সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা: ধর্ম সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহাযতা করে। ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা, অনুশাসন ও আচার-অনুষ্ঠান মানুষকে সুসংগঠিত করে এবং তাদেরকে সহিষ্ণু ও সহনশীল করে তোলে। সুতরাং ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা, অসন্তুষ্টি প্রভৃতি দূর হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

ঘ) সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ: ধর্ম মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে মানুষের মধ্যে পরিচিতি, সম্পর্ক, বন্ধন, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ইত্যাদি গুণাবলি বিকশিত হয়। এসব গুণ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ঙ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষ অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। রাষ্ট্র ও আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেক সময় অপকর্ম করলেও সৃষ্টিকর্তাকে ফাঁকি দিয়ে কোনো অপকর্ম করা সম্ভব নয়। এ বিশ্বাস ও নীতিবোধ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

চ) আর্তমানবতার সেবা: আর্তমানবতার সেবায় ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতে মানুষ দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, বিধবা, প্রবীণ, অসুস্থ, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণির সহায়তায় এগিয়ে আসে। এতে পরোক্ষভাবে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। আবার সমাজসেবার সাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সাথে সাথে শিক্ষা, সচেতনতা সৃষ্টি, সমাজসংস্কার, সামাজিকীকরণ, মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে, যা প্রকারান্তরে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক।

ছ) শান্তির নিশ্চয়তা বিধান: ধর্ম পার্থিবজীবন এবং পারলৌকিকজীবন এ দুটো ক্ষেত্রেই শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। এজন্য ধার্মিক লোকের বৈষয়িক চাহিদা কম যা মানুষকে পরকালের সুন্দর জীবনের জন্য সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। মানুষের জীবনের এই যে নিশ্চয়তা তা সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

জ) জনকল্যাণ: ধর্ম জনকল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখে। সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান যেমন– জাকাত, দানশীলতা, ফিতরা, ওয়াকফ, দেবোত্তর প্রথা, ধর্মগোলা, দাতব্য চিকিৎসালয়, লঙ্গরখানা, এতিমখানা প্রভৃতি জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণে অনন্য ভূমিকা পালন করে। এরূপ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করে।

ঝ) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের পাশাপাশি ধর্ম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হওয়ার জন্যও উৎসাহিত করে, যা সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টা। মানুষ বিভিন্ন কারণে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। ধর্মের প্রায়শ্চিত্তমূলক পদক্ষেপ মানুষকে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপনে সহায়তা করে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষার উৎস, যা মানুষের আত্মউন্নয়ন ঘটায়। যাতে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে। এজন্য ধর্মের অনুসারীরা পবিত্র জীবনের আশায় নিজেদের ভালো কাজ করার প্রেরণা লাভ করে, যা সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

ধর্ম একটি মৌলিক ও পুরাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায়ও ধর্মের অস্তিত্ব দেখা যায়। আভিধানিক অর্থে ধর্ম বলতে এমন এক বিষয়কে বুঝায়, যা ব্যক্তি ও জাতীয়জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করে ও সংহতি আনয়ন করে। আবার সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু হতে ধর্ম প্রত্যয়ের উৎপত্তি। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা। এই অর্থে বলা যায়, মানুষ যা ধারণ করে তা-ই ধর্ম। ধর্ম হলো এমন কতগুলো নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান বা বিশ্বাস, যা মানবজীবনকে সত্য সুন্দর, পবিত্র ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। সাধারণত ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসগত ব্যাপার, যাতে স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়। সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে ধর্ম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। কেননা ধর্ম সমাজে আইন ও নীতিবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে। প্রচলিত অর্থে আইনের যে শাসন রয়েছে তার তুলনায় ধর্মের নৈতিক শাসন বেশি কার্যকর। ধর্ম মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষার উৎস, যা মানুষের আত্মউন্নয়ন ঘটায়। ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়ে সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। Religion শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ক) ইংরেজি খ) গ্রিক
গ) ল্যাটিন ঘ) স্প্যানিশ

২। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্ম কীভাবে ভূমিকা রাখে-
i. সমাজে আইন ও নীতিবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে
ii. মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটিয়ে
iii. মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৬ ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social worker in Forming Religious Values)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৬.১ ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৬.১ ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Forming Social Values)

সাধারণভাবে ধর্মীয় অনুশাসন এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, রীতিনীতি, আদর্শ, দর্শন, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, মতামত ইত্যাদির সমষ্টিকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়। সকল ধর্মের মূল্যবোধগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণে নিবেদিত। যার মধ্যে মানবীয় মর্যাদার মূল্য ও স্বীকৃতি, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা, শ্রমের মর্যাদা, সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার, মানবতার সেবা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের জন্য সমাজকর্মী যেসব মৌলিক কৌশল ব্যবহার করতে পারেন তার মধ্যে অন্যতম হলো সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ কৌশল।

সমাজকর্ম পেশা কর্তৃক নির্ধারিত ও স্বীকৃত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কলাকৌশলের ভিত্তিতে সমাজকর্মী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ। সমাজকর্মীকে প্রথমে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সির সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে এবং একটি সুপরিকল্পিত কর্মকাঠামো তৈরি করতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধ গঠন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন, পারলৌকিকতা, ন্যায়বোধ, মানবতা প্রভৃতি বিষয় পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনায় আনতে হবে। তাছাড়া সমাজের মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করে এক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করলেই সমাজকর্মী ধর্মীয় মূল্যবোধের গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও পরিবারিক নিয়ন্ত্রণহীনতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের প্রতি অশ্রদ্ধা, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিগত/রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে একটা ঢাল হিসেবে অপব্যবহার, ন্যায় ও মানবতা-বিবর্জিত মানসিকতা, ভারসাম্যহীন সামাজিক ব্যবস্থা, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চিন্তাভাবনা, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা, প্রভৃতি ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ধর্মের মানবতাবাদী আহ্বানকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্মী পদ্ধতি প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ে সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মী ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত ক্ষমতাকে ব্যাবহার করে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, তাই ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবার ও সমাজ সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সমাজকর্মীকে স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রভাবশালী মহলোকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে হয়। সমাজকর্মীকে সভাসমিতি, সেমিনার, বক্তৃতা, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, পোষ্টার, মুক্ত আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে ইতিবাচক ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়।

সমাজকর্ম অনুশীলনধর্মী (practice oriented) সামাজিক বিজ্ঞান যার অন্যতম পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সংগঠন ও সামাজিক কার্যক্রম। উক্ত সকল পদ্ধতিতেই ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যবহার হয়ে থাকে। বিশেষ করে সমষ্টি সংগঠন ও সামাজিক কার্যক্রমে সামাজিক আন্দোলন পরিচালনায় স্থানীয় এলাকায় অনুসৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেমন– দুর্নীতি, যৌতুক, নারীনির্যাতন, বাল্যবিবাহ, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এ ধরণের হস্তক্ষেপে প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক মূল্যবোধ গঠন করা হয়। বলা হয় মূল্যবোধের অভাবে সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ব্যবস্থা বিপজ্জনক, কঠিন ও বিশৃঙ্খল রূপ

ধারণ করে। তাই ধর্মীয় মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করে সমাজকর্মী, আন্তঃব্যক্তিক ও পরিবেশগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনা সৃষ্টি করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে ধর্মীয় অনুশাসন এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, রীতিনীতি, আদর্শ, দর্শন, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, মতামত ইত্যাদির সমষ্টিকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়। সকল ধর্মের মূল্যবোধগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণে নিবেদিত যার মধ্যে মানবীয় মর্যাদা মূল্যের স্বীকৃতি, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা, শ্রমের মর্যাদা, সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার, মানবতার সেবা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় অনুশাসনের ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের জন্য সমাজকর্মী যেসব মৌলিক কৌশল ব্যবহার করেন তার মধ্যে অন্যতম হলো সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ কৌশল। সমাজকর্মী আন্তঃব্যক্তিক ও পরিবেশগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মূল্যবোধ গঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনা সৃষ্টি করে সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে সহযোগিতা করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি অনুশীলনধর্মী (practice oriented) সামাজিক বিজ্ঞান?

ক) সমাজকর্ম খ) সমাজবিজ্ঞান

গ) অর্থনীতি ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

২। সমাজকর্মের যেসকল পদ্ধতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যবহার হয়ে থাকে–

i. ব্যক্তি সমাজকর্ম

ii. সমষ্টি সংগঠন

iii. সামাজিক কার্যক্রম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৭ গণমাধ্যমের ধারণা, ধরন ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা (Concept, Types and the Role of Mass Media in Preventing Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৭.১ গণমাধ্যম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.৭.২ গণমাধ্যম্যের ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।
৪.৭.৩ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৭.১ গণমাধ্যম্যের ধারণা (Concept of Mass Media)

গণমাধ্যমের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘Mass Media’। ইংরেজি ‘Mass’ শব্দের অর্থ গণ বা বৃহৎ জনগোষ্ঠী এবং ‘Media’ শব্দের অর্থ মাধ্যম বা বাহন। অতএব, শব্দগত অর্থে Mass Media হচ্ছে যে মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় অথবা সংবাদ পৌছায় বা সম্পর্কের উন্নতি হয়।

সাধারণ অর্থে গণমাধ্যম বলতে জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, গণমাধ্যম হচ্ছে এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমাজের ব্যাপকসংখ্যক মানুষের সাথে আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। গণমাধ্যমের ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। ভাষা ছাড়া যোগাযোগ অসম্ভব। যেমন– বইপুস্তক, সাময়িকী, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। সুতরাং, ভাষাভিত্তিক যে যোগাযোগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য মানুষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তথ্যের আদানপ্রদান হয় তাই গণমাধ্যম।

গণমাধ্যমের ধারণায় সমাজবিজ্ঞানী B. Bhusan (১৯৮৯) বলেন, “গণমাধ্যম প্রত্যয়টি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যে কোনো উপায়কে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো তথ্য ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে (Mass media is the concept used for any means of instrument of communication which is reaching large number of people like books, periodicals radio, television and motion picture.)।” M. C. Forland গণমাধ্যমের ধারণা দিতে গিয়ে বলেন, “গণমাধ্যম হচ্ছে জনগণের মধ্যে কোনো কিছুর অর্থ সম্পর্কে অনুভূতি সঞ্চার করা এবং ভাব বা ধারণার প্রেরণ প্রক্রিয়া।”

D.S Mehta বলেন, “একই সময়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, ধ্যানধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করাকে গণমাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।”

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, গণমাধ্যম হচ্ছে যোগাযোগের এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং তথ্যের আদানপ্রদান করা হয়। গণযোগাযোগের কাজে ব্যবহারের জন্য যে মাধ্যম তা হলো গণমাধ্যম। অগণিত পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্রের সমন্বয়ই গণমাধ্যম।

৪.৭.২ গণমাধ্যমের ধরন (Types of Mass Media)

আধুনিক সমাজে তিন ধরনের গণমাধ্যম রয়েছে। যথা–

১। মুদ্রিত গণমাধ্যম; যেমন– সংবাদপত্র, বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, লিফলেট ইত্যাদি।
২। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম; যেমন– চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি।
৩। অপ্রত্যক্ষ গণমাধ্যম; যেমন– সংবাদ সংস্থাসমূহ, সাংবাদিক সংঘ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

নিচে বর্তমান যুগে প্রচলিত গণমাধ্যমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

৪.৭.২.১ পত্র-পত্রিকা (Papers-journals): আধুনিক গণমাধ্যমের সর্বাধিক প্রভাবশালী উপাদান হচ্ছে পত্র-পত্রিকা। এর চাহিদা, উপযোগিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। জানা যায় চীনারা সর্বপ্রথম সংবাদপত্র ব্যবহার করতো। উপমহাদেশের প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম ‘সমাচার দর্পণ’ ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। পত্র-পত্রিকা হচ্ছে সমাজের দর্পণ। প্রতিদিন সমাজে যা কিছু ঘটে তাই পত্রিকার পাতায় সাজানো থাকে। তথ্য সরবরাহ, জনমত গঠন,

মানুষের মতামত প্রকাশ, সত্য উপস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পত্র পত্রিকা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালন করে। পত্র-পত্রিকা সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বলা যেতে পারে, একটি পূর্ণাঙ্গ পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালে সমগ্র সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা লাভ করা যায়। তাই পত্র-পত্রিকাকে 'সমাজের দর্পণ' বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪.৭.২.২ বেতার (Radio): গণমাধ্যমের আরো একটি শক্তিশালী উপাদান হচ্ছে রেডিও। ইলেকট্রনিক এই সামগ্রীর সাথে পরিচিত নয় এমন মানুষ বিরল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রেডিওর প্রচলন হয়। Wikipedia, "*The Free Encyclopedia*" এর তথ্যানুযায়ী, ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এটি চিত্তবিনোদন, সংবাদ পরিবেশন, সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিবিষয়ক অসংখ্য অনুষ্ঠান প্রচার করছে। মানুষের মধ্যে রেডিওর প্রভাব অপরিসীম। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চ্যানেলে পরিবেশিত অনুষ্ঠানমালা এবং পরিবেশিত সংবাদ ও তথ্যপ্রবাহ গণমাধ্যমের শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি এফ.এম. রেডিও এক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

৪.৭.২.৩ টেলিভিশন (Television): গণমাধ্যমের অন্যতম শক্তিশালী বাহন হচ্ছে টেলিভিশন। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এটি যাত্রা করে আজ সমগ্র বিশ্বের জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Wikipedia, "*The Free Encyclopedia*" এর তথ্যানুযায়ী, ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয় এবং ১৯৮০ সালে দেশে রঙিন টেলিভিশন চালু হয়। স্যাটেলাইটের এ যুগে টেলিভিশনের আবেদন ও উপযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ খুব সহজেই বিশ্বকে দেখতে পায় তার ড্রয়িং রুমে বসে। শিক্ষা, সচেতনতা, জনমত গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেলিভিশন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। টেলিভিশন হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান। সমাজস্থ মানুষের খুব কাছের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর সাথে মানুষের সখ্যতা রয়েছে। তাই সমাজে এর প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অতুলনীয়।

চিত্র ৪.৭.১ : গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন

৪.৭.২.৪ চলচ্চিত্র (Cinema): গণমাধ্যমের অন্যতম আধুনিক উপাদান হচ্ছে চলচ্চিত্র। Wikipedia, "*The Free Encyclopedia*" এর তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয় ১৮৯০ সালে। ১৯২৭-২৮ সালে ঢাকার নওয়াব পরিবারের কয়েকজন তরুণ মিলে সুকুমারী নামক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৫৬ সালে মুখ ও মুখোশ নামক পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র নির্মান করেন আবদুল জব্বার খান। সুনির্দিষ্ট গল্প-কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র কিংবা প্রামাণ্যচিত্র মানবসমাজে গভীরভাবে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এখানে সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি চমৎকারভাবে পরিবেশন করা হয়। অন্য যে কোনো মাধ্যম অপেক্ষা চলচ্চিত্র মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত করে।

৪.৭.২.৫ ইন্টারনেট (Internet): গণমাধ্যমের সাম্প্রতিক ও সর্বাধুনিক বাহন হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটেরন মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহে নবযুগের সূচনা ঘটেছে। ইন্টারনেটের বিস্ময়কর যাদুর স্পর্শে আমরা আজ ঘরে বসেই সারা বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ শোনা, দেখা ও তথ্যের আদানপ্রদান করতে পারছি। আবার ইন্টারনেটে বিখ্যাত লাইব্রেরির বইপুস্তক, গবেষণাগ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পড়ার চমৎকার সুযোগ রয়েছে। Wikipedia, "*The Free Encyclopedia*" এর তথ্যানুযায়ী, ইন্টারনেটের আবিষ্কার ১৯৬০ সালের শেষের দিকে এবং বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে অফলাইন ই-মেইল এর মাধ্যমে সীমিত আকারে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়। বিশ্বের অগণিত মানুষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে ইন্টারনেটের কল্যাণে, ইন্টারনেট বিশ্বকে অনেক ছোট ও গতিশীল করে তুলেছে। ইন্টারনেট বহুবিধ সুবিধা প্রদান করে বদলে দিয়েছে আমাদের জীবনযাত্রাকে।

৪.৭.৩ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা (Role of Mass Media in Preventing Social Problem):

আধুনিক সমাজের একটি প্রভাবশালী এবং বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয় হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণ তথা সমাজের সাথে এর অধিক সম্পৃক্ততার কারণে সমাজদেহে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা

প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করা হলোঃ

ক) সামাজিক আচরণে পরিবর্তন আনয়নঃ বর্তমান যুগ হলো গণমাধ্যমের যুগ। বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন- সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মানুষের সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, বিভিন্নরকম সংস্কার ও বিশ্বাস মানুষের আচরণে স্থায়িত্ব লাভ করে, যা মানুষকে নৈতিক পথে ধাবিত করে এবং সামাজিক সমস্যা ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং আদর্শ মানুষের অনুসরণে সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলে।

খ) জনমত গঠনঃ গণমাধ্যম জনমত গঠনের শক্তিশালী বাহন। সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে এবং প্রতিরোধে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন পূর্বে ইভটিজিং নামক সামাজিক ব্যাধি সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। যার ফলে এর মাত্রা অনেক কমে এসেছে।

গ) সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনঃ সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে গণমাধমের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত গণমাধ্যম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ, আচরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে গণমাধ্যম। যা সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে।

ঘ) জনসংখ্যা বিস্ফোরন রোধঃ গণমাধ্যম পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে জনসংখ্যা সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে।

ঙ) দুর্যোগ মোকাবিলাঃ জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বর্তমানে দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচারের মাধ্যমে গণমাধ্যম দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

চ) চিত্তবিনোদনের মাধ্যমঃ চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও গণমাধ্যম ব্যবহৃত হয় যা ক্লান্তি, হতাশা ও অশান্তি দূর করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ছ) জনসচেতনতা সৃষ্টিঃ গণমাধ্যম মানুষের বিভিন্নমুখী শিক্ষা প্রদান করে তাদের সচেতন ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে যেমন- গণশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতি সম্প্রসারনের মাধ্যমে সাহায্য করে। মাদকদ্রবের অপব্যবহার প্রতিরোধে গণমাধ্যম ভূমিকা পালন করে। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা সমাধানে গণমাধ্যম বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে ভূমিকা রাখে। অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে গণমাধ্যম। স্বাস্থ্যহীনতা একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

জ) অপরাধ দূরীকরণে আইন প্রণয়ন ও আইনের বাস্তবায়নঃ মাদকাসক্তি প্রতিরোধে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন- পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি মাদকাসক্তের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। মাদকাসক্তি দূরীকরণে দেশের বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনবোধে নতুন আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের ওপর গণমাধ্যম চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন- পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি মাদকাসক্তের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে।

ঝ) যৌতুক নিরোধঃ যৌতুক একটি জঘন্যতম ও ঘৃণ্যতম প্রথা। যৌতুকের অভিশাপ থেকে সমাজকে সুরক্ষায় গণমাধ্যম কার্যকর অবদান রাখতে পারে। যৌতুক বিরোধী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, যৌতুক বিরোধী অইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, যৌতুক দাবীকারীদের সামাজিকভাবে বয়কট করার প্রবণতা সৃষ্টি করে গণমাধ্যম যৌতুক সমস্যা প্রতিরোধে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঞ) নারী ও শিশু পাচার রোধ: নারী ও শিশু পাচার রোধেও গণমাধ্যম শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। যেখানে প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে, সেখানেই গণমাধ্যমের নির্ভীক উচ্চারণ ধ্বনিত হয়। দেশের নারীদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে নারীমুক্তিতে গণমাধ্যম তার বলিষ্ঠ অবদান রাখে।

এছাড়া গণমাধ্যম নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণ, জাতিগত সমস্যা নিরসন, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

গণমাধ্যম বলতে জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, গণমাধ্যম হচ্ছে এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমাজের ব্যাপকসংখ্যক মানুষের সাথে একটি আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্টিত হয়। গণমাধ্যমের ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। ভাষা ছাড়া যোগাযোগ অসম্ভব। সুতরাং ভাষাভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তথ্যের আদানপ্রদান হয় তাই গণমাধ্যম। আধুনিক সমাজে তিন ধরনের গণমাধ্যম রয়েছে। যথা– ক) মুদ্রিত গণমাধ্যম, যেমন– সংবাদপত্র, বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, লিফলেট ইত্যাদি, খ) ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম, যেমন– চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি গ) অপ্রত্যক্ষ গণমাধ্যম, যেমন– সংবাদ সংস্থাসমূহ, সাংবাদিক সংঘ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। আধুনিক সমাজের একটি প্রভাবশালী এবং বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয় হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণ তথা সমাজের সাথে এর অধিক সম্পৃক্ততার কারণে সমাজদেহে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। গণমাধ্যম নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণ, জাতিগত সমস্যা নিরসন, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার মাধ্যম কোনটি?

ক) গণমাধ্যম   খ) সামজিক কার্যক্রম

গ) সামজিক আন্দোলন   ঘ) ধর্ম

২। বাংলাদেশে রঙিন টেলিভিশন চালু হয় কত সালে?

ক) ১৯৭০ সালে   খ) ১৯৭৫ সালে

গ) ১৯৮০ সালে   ঘ) ১৯৮৫ সালে

পাঠ-৪.৮ গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Developing the Role of Mass Media)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৮.১ গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৮.১ গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Developing the Role of Mass Media)

গণমাধ্যম আধুনিক বিশ্বে যোগযোগের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। এগুলোতে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিসহ বহির্বিশ্বের জীবনচিত্রের প্রতিফলন ঘটে যা পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের প্রতীকীমূলক ভাবের আদানপ্রদান হয়। এসব ভাবের আদানপ্রদান সকল শ্রেণির মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন– বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনা, রুচিসম্মত অনুষ্ঠান প্রচার, নির্মল বিনোদন আয়োজন প্রভৃতি। যদি এগুলোর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়।

গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে গণমাধ্যম তার যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে আর এ অবস্থা উত্তরণে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপূণ্যকে কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে সঠিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ কৌশল অবলম্বন করেন।

সমাজকর্মী প্রথমে কার্যক্ষেত্রে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে একটি সুপরিকল্পিত কর্মকাঠামো তৈরি করবেন। গণমাধ্যম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ করবেন। এক্ষেত্রে মানবাধিকার সংস্থা, মিডিয়াকর্মী, গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে নিয়োজিত সংগঠন, গণমাধ্যমের উন্নয়নে পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন উৎস পর্যালোচনা করে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিকূলতা চিহ্নিত করবেন।

সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণ আরোপ, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আনুগত্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, তথাকথিত গডফাদারদের হুমকি, গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতা, বস্তুনিষ্ঠতার অভাব প্রভৃতিকে গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে পারেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে সভাসমিতি, সেমিনার, বক্তৃতা, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, পোস্টারিং, মুক্ত আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, আইনবিদ, সুশীলসমাজ, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসহ বিভিন্ন পেশা ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমর্থনে গণমাধ্যমের উন্নত ভূমিকা পালনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সারসংক্ষেপ

গণমাধ্যম আধুনিক বিশ্বে যোগযোগের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। এগুলোতে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিসহ বহির্বিশ্বের জীবনচিত্রের প্রতিফলন ঘটে যা পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের প্রতীকীমূলক ভাবের আদানপ্রদান হয়। এসব ভাবের আদানপ্রদান সকল শ্রেণির মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন– বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনা, রুচিসম্মত অনুষ্ঠান প্রচার, নির্মল বিনোদন আয়োজন প্রভৃতি। যদি এগুলোর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে

সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, আইনবিদ সুশীল সমাজ, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসহ বিভিন্ন পেশা ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমর্থনে গণমাধ্যমের উন্নত ভূমিকা পালনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজের দর্পণ বলা হয় কোনটিকে ?

ক) সংস্কৃতি খ) গণমাধ্যম
গ) সমাজ সংস্কার ঘ) ধর্ম

২। গণমাধ্যমের প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো–

i. সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণ আরোপ
ii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব
iii. গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৯ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা ও ধরন এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা (Concepts and Types of Law Enforcement Agency and the Role of Law Enforcement Agency to Combat Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৯.১ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কী তা বলতে পারবেন।
৪.৯.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধরনসমূহ লিখতে পারবেন।
৪.৯.৩ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৯.১ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা (Concept of Law Enforcement Agency)

সাধারণভাবে বলা যায়, দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগের জন্য যে সংগঠনগুলো নিবেদিতপ্রাণ তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়।

Burton's Legal Theasaurus Dictionary (২০০৭) এর ভাষ্য অনুযায়ী, "স্থানীয় রাজ্য অথবা জাতীয় সরকার দ্বারা অনুমোদিত একটি সংস্থা যা আইন প্রয়োগ করে এবং আইন ভঙ্গকারীদের গ্রেফতার করে (A body sanction by local, state or national government to enforce laws and apprehend those who break them.)।"

Word Net 30 এর সংজ্ঞানুযায়ী, "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন একটি সংস্থা যা অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত (Law enforcement agency's an agency responsible to insure obedience to the laws.)।"

Wikipedia ত বলা হয়েছে, "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন একটি সংস্থা যা আইনকে প্রয়োগ করে। এটা স্থানীয়, রাজ্য বা ফেডারেল সংস্থা হতে পারে।" যেমন– সিআইডি। এটা আরো বুঝাতে পারে জাতীয় পুলিশ বাহিনীকে, তাছাড়া আরো বুঝাতে পারে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে, যেমন– ইন্টারপোল, ইউরোপোল ইত্যাদি।

চিত্র ৪.৯.১ : বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (ধারা ১৫২[১]) অনুসারে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অর্থ (ক) স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী (খ) পুলিশ বাহিনী (গ) আইনের দ্বারা এ সংজ্ঞার অন্তর্গত বলে ঘোষিত যেকোনো শৃঙ্খলা বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন একটি সরকারি সংস্থা যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার প্রচলিত আইন প্রয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতাবান, অপরাধ তদন্ত এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যাদের রয়েছে এমন কিছু ক্ষমতা যা অন্য সরকারি সংস্থা ভোগ করে না। যেমন– কোনো কিছু অনুসন্ধান, আটক এবং বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা।

৪.৯.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধরন (Types of Law Enforcement Agencies)

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে পৃথক করা যায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক হতে পারে।

বিভিন্ন দেশ তাদের অবস্থান অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস করে থাকে। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধানত চার ধরণের। যথা:
(১) বাংলাদেশ পুলিশ (Bangladesh Police);
(২) বাংলাদেশ আনসার (Bangladesh Ansar);
(৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (Bangladesh Coast Guard);
(৪) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (Village Defence Party)।

(১) বাংলাদেশ পুলিশ (Bangladesh Palice): বাংলাদেশের প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো বাংলাদেশ পুলিশ। এটা বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচলিত হয়। এটি বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও পুলিশ প্রধানত আইন ও আদেশ বাস্তবায়ন এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত, তবুও অপরাধ বিচার ব্যবস্থায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ পুলিশের কতগুলো শাখা রয়েছে। যেমন–

- র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটিলিয়ন বা র‌্যাব (Rapid Action Battalian) RAB
- বিশেষ মহিলাো পুলিশ বাহিনী (Special Women Police Contingent)
- বিমানবন্দর সশস্ত্র পুলিশ (Airport Armed Police)
- জেলা পুলিশ (District Police)
- মেট্রোপলিটন পুলিশ (Metropoliton Police)
- গোয়েন্দা শাখা বা ডিবি (Detective Branch) DB
- বিশেষ অস্ত্র ও কৌশল ইউনিট বা সোয়াট (Special Weapons and Tactics) SWAT
- ট্রাফিক পুলিশ (Traffic Police)
- বিশেষ শাখা বা এসবি (Special Branch) SB
- অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি (Criminal Investigation Department) CID
- রেলওয়ে পুলিশ (Railway Police)
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ (Industrial Police) ইত্যাদি।

(২) বাংলাদেশ আনসার (Bangladesh Ansar): বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং আইন প্রয়োগে নিয়োজিত একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হলো বাংলাদেশ আনসার। বাংলাদেশ সরকারেরর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ বাহিনী পরিচালিত হয়। আরবি শব্দ আনসার থেকে নামকরণ করা হয়েছে। যার অর্থ সাহায্যকারী।

(৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (Bangladesh Coast Guard): বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা। এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কিন্তু এর অফিসাররা বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে বদলী হয়ে আসে। এর সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

(৪) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (Village Defence Party): গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বাংলাদেশের একটি আইন প্রয়োগকারী বাহিনী। এর ইউনিটগুলো-জেলা, উপজেলা এবং গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত। যদিও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানই এর প্রধান উদ্দেশ্য তবুও গ্রামীণ উন্নয়নমূলক এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বও এ বাহিনীর রয়েছে।

৪.৯.৩ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা (The Role of Law Enforcement Agency to Combat Social Problem)

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এমন একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী যারা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় তাদের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা নিচে দেওয়া হলো:

অপরাধ বর্তমান সময়ের একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরাধীদের আটক, অপরাধ তদন্ত ও বিশ্লেষণ, অপরাধীদের শাস্তি প্রদান, অপরাধ প্রতিরোধমূলক যোগাযোগ

ব্যবস্থা সৃষ্টি, সর্বোপরি অপরাধ নির্মূল অভিযান পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখে।

মাদকাসক্তি বর্তমানের এক সর্বগ্রাসী সমস্যা। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এটি ভয়াবহ এক সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সার্থকভাবে সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক সকল ধরনের পদক্ষেপেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও তার অপব্যবহার রোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাদকের চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও আইনের হাতে হস্তান্তর এবং মাদকের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা রয়েছে। নারী ও শিশু অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পাচার, যৌতুকের কারণে নির্যাতন, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, ইভটিজিংসহ অন্যান্য সহিংসতা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রশাসনকে সহায়তা করে।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দমন করে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা সর্বজনবিদিত। তাছাড়া মানুষের অগ্রহণীয় ও সমাজবিরোধী আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভূমিকা পালন করে।

আইনের শাসন এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি, সাইবার অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, সংঘবদ্ধ অপরাধ, চোরাচালান, ঘুষ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারি প্রভৃতি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জরুরি সাহায্য প্রদান করার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গ্রামীণ উন্নতি ও কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা পালন করে।

শিশুশ্রম বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। বিদ্যমান শিশুশ্রম নিরসনমূলক আইনসমূহ এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কিত আইনগুলোর যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। যুব অসন্তোষ, শ্রমিক অসন্তোষ ও পরিবেশদূষণ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে।

এছাড়া ট্রাফিক আইন বজায় রাখা, নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা, গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা, বিচারিক দলিলাদি ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা, খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রতিরোধ ও গুণগতমান পরীক্ষা, সড়ক, রেলপথের নিরাপত্তা বিধান, যানজট নিরসন ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং নাগরিক সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে বলা যায়, দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগের জন্য যে সংগঠনগুলো নিবেদিতপ্রাণ তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন সরকারি সংস্থা যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার প্রচলিত আইন প্রয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতাবান এবং অপরাধ তদন্ত ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যাদের রয়েছে এমন কিছু ক্ষমতা যা অন্য সরকারি সংস্থা ভোগ করে না। যেমন– কোনো কিছু অনুসন্ধান, আটক এবং বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধানত চার ধরনের। যথা– (১) বাংলাদেশ পুলিশ, (২) বাংলাদেশ আনসার, (৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও (৪) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এমন একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী যারা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক সমস্যা সমাধানে তাদের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধানত কয় ধরণের?

ক) তিন খ) চার
গ) পাঁচ ঘ) ছয়

২। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সাধারণত যে কাজগুলো করে থাকে–

i. নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সামাজিক আইন প্রয়োগে সহায়তা
ii. গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা, বিচারিক দলিলাদি ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা
iii. অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং নাগরিক সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.১০ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব পালনে সমাজকর্মীর সহায়তামূলক ভূমিকা (The Helping Role of Social Worker in Performing Duties of Law Enforcement Agency)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.১০.১ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব পালনে সমাজকর্মীর সহায়তামূলক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.১০.১ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব পালনে সমাজকর্মীর সহায়তামূলক ভূমিকা (The Role of Social Worker in Performing Duties of Law Enforcement Agency)

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রচলিত আইনের প্রয়োগ এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়। সমাজকর্মী হলেন পেশাদার সমাজকর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, আভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেন। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে সক্ষমকারী, সমন্বয়কারী, সহায়তাকারী, পরিচালক প্রভৃতি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা প্রদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো :

সমাজকর্মী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা দানে প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সির সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। পর্যাপ্ত তথ্য অনুসন্ধান করবেন। এ স্তরে সমাজকর্মীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, সম্পদ, সমস্যা, উদ্দেশ্য, আদর্শ, শক্তি-সামর্থ্য, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কর্মপরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে জরিপের মাধ্যমে পর্যাপ্ত তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়।

জরিপের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যাপারে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমাজকর্মী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো চিহ্নিত করবেন। যেমন–স্বাধীনতার অভাবে ক্ষমতায় থাকা দলের স্বার্থ সংরক্ষণ করে আইন প্রয়োগ, আত্মরক্ষা ও আইনবিরোধী কাজ প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব, পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো যেমন– যানবাহন, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রযুক্তির অভাব, অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের সাথে সখ্য, পরিবারিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতি, চাকরির নিশ্চয়তা প্রভৃতির ব্যাপারে রাজনৈতিক বিবেচনা, ভালো কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনার অভাব, অযোগ্য প্রশাসনিক ব্যাবস্থা, বিভিন্ন সামাজিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, পেশাদারি মনোভাবের অভাব প্রভৃতি।

উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথাযথ ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য সমাজকর্মী সমস্যার ব্যাপকতা ও প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করতে পারেন। এক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল ও মাধ্যমের যেমন– সভা, সেমিনার, বক্তৃতা, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, পোস্টার, মুক্ত আলোচনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায়তাদান কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে সমাজকর্মীকে সামজে অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমর্থন অর্জন অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে আইনবিদ, শিক্ষক, আইন প্রয়োগকারী দল, সুশীলসমাজ, আইনি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংস্থা প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে সমাজকর্মী অগ্রসর হবেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যাতে স্বাধীনতা, পর্যাপ্ত সম্পদের প্রাপ্যতা, অনুপ্রেরণা ও যোগ্য প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ও অনুকূল পরিবেশ প্রভৃতি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা লাভ করে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সমাজকর্মী নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দেশপ্রেম, কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানসিকতা সৃষ্টিতে সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রচলিত আইনের প্রয়োগ এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়। সমাজকর্মী হলেন পেশাদার সমাজকর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, আভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেন। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে সক্ষমকারী, সমন্বয়কারী, সহায়তাকারী, পরিচালক প্রভৃতি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায়তাদান কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে সমাজকর্মীকে সামজে অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমর্থন অর্জন অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে আইনবিদ, শিক্ষক, আইন প্রয়োগকারী দল, সুশীলসমাজ, আইনি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংস্থা প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে সমাজকর্মী অগ্রসর হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পেশাদার সমাজকর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়–
ক) সমাজকর্মী খ) সমাজবিজ্ঞানী
গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঘ) অর্থনীতিবিদ

২। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাধারণত যেসকল প্রতিকূলতা রয়েছে–
i. স্বাধীনতার অভাবে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থ সংরক্ষণ
ii. আইনবিরোধী কাজ প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব
iii. পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো যেমন– যানবাহন, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রযুক্তির অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আধুনিক সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ কোনটি?
ক) সামাজিক প্রতিষ্ঠান খ) সামাজিক সংস্থা
গ) সামাজিক পরিবেশ ঘ) রাজনৈতিক সংগঠন

২। বিবাহ কী?
ক) একটি দলিল খ) সামাজিক চুক্তি
গ) সামজিক সংস্থা ঘ) সামাজিক প্রথা

৩। বাংলাদেশের প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোনটি?
ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী খ) র‌্যাব
গ) বাংলাদেশ পুলিশ ঘ) বাংলাদেশ নৌবাহিনী

৪। বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যেসকল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়-
i. স্বামী-স্ত্রীর বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা
ii. অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব
iii. দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। অপরাধপ্রবণতার অন্যতম কারণ–

i. অধিক জনসংখ্যা

ii. মনোদৈহিক সমস্যা

iii. পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। মানবজীবনের শাশ্বত বিদ্যাপীঠ কোনটি?

ক) পরিবার খ) বিদ্যালয়

গ) সমাজ ঘ) মক্তব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:

রিফাত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার একজন অফিসার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত সংস্থাটির সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

৭। উদ্দীপকে রিফাতের কর্মরত সংস্থাটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে?

ক) বাংলাদেশ নৌবাহিনী খ) বাংলাদেশ কোস্টগার্ড

গ) বাংলাদেশ আনসার ঘ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

৮। উদ্দীপকে রিফাতের কর্মপরিধি নির্দেশ করে–

i. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী জেলেদের অনুপ্রবেশ ঠেকানো

ii. সমুদ্রপথে চোরাচালান রোধ করা

iii. বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদ রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বর্তমানে দুর্যোগের আগাম খবর প্রচারের মাধ্যমে গণমাধ্যম যে ধরনের ভূমিকা পালন করে–

i. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন

ii. দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি রোধ

iii. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। নিচের কোনটির মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহে নবযুগের সূচনা ঘটেছে?

ক) রেডিও খ) টেলিভিশন

গ) ইন্টারটে ঘ) ফেসবুক

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। যৌতুকের দাবিতে স্বামী ও শ্বশুর কর্তৃক নির্যাতিত রহিমা গ্রামের মাতব্বরদের কাছে ধরনা দিয়েও কোনো বিচার না পেয়ে অবশেষে একটি দৈনিক পত্রিকার স্থানীয় রিপোর্টারের কাছে নিজের অসহায়ত্বের কথা খুলে বলে। দৈনিক পত্রিকাটি উক্ত খবর প্রকাশ করার পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গ্রামের মাতব্বরসহ অপরাধীদের গ্রেফতার করে।

ক) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট চালু হয় কবে? ১

খ) ধর্ম বলতে কী বোঝেন? ২

গ) উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত দুটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতামূলক ভূমিকা অপরাধ নির্মূলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। নিচের চিত্রসমূহ দেখুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

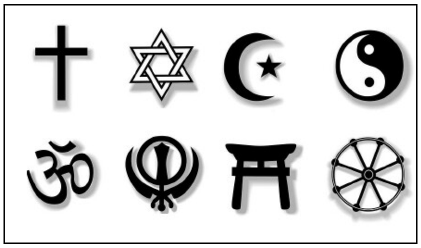

ক) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবে টেলিভিশন চালু হয়? ১

খ) বিবাহ বলতে কী বোঝেন? ২

গ) উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা চিত্রিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে চিত্রিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১	১। ক	২। ঘ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২	১। ক	২। ঘ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩	১। খ	২। ঘ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪	১। ক	২। ঘ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫	১। গ	২। ঘ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬	১। ক	২। ঘ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭	১। ক	২। গ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮	১। খ	২। ঘ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯	১। খ	২। ঘ						
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১০	১। খ	২। ঘ						
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৪	১। ক	২। খ	৩। গ	৪। ঘ	৫। ঘ	৬। ক	৭। ক	
	৮। ঘ	৯। ঘ	১০। গ					